Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No. 148-170
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

গান্ধি ও আম্বেদকরের দৃষ্টিতে নারী– একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ড. অজয় কুমার দাস
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

***Abstract*:**

Women played a great role in the life of both Gandhiji and Ambedkar. Putlibai, Gandhiji's mother wrote extensively, particularly on the introduction to Gandhiji's non-violence movement. Gandhiji gained his spiritual base from his mother. Besides, it goes without saying that Kasturbai, his wife, had also a mentionable role in Gandhiji's life and activity. She was enduring too. In Indian freedom movement, when he was leading the movement in the way of non-violence and non-cooperation, he got the unique co-fighters like Sarala Devi, daughter of Rabindranath's elder sister Swarnakumari Devi, British young lady, Mira Behn and Sarojini Naidu. Both Ramabai and Dr. Sarada Kabir, Dr. B. R. Ambedkar's first wife and the lady, whom he married after the death of his first wife respectively, gave care, inspiration to Ambedkar's selfless dedicated life.

But there was a big difference between Gandhiji and Ambedkar in their approach to women. Gandhiji gave importance to tradition and heritage. Ambedkar always sought for the untouchable and underprivileged women. Both were against the child marriage. But though Gandhiji supported the widow marriage of minors, he did not agree with the opinion in favour of widow-marriage of adult women. Whereas Ambedkar whole-heartedly supported the widow-marriage irrespective of age. Both thought of dowry as stigma of the society. But unlike Ambedkar Gandhiji did not go in favour of birth control. Gandhiji

laid emphasis on women's household duties, nourishing of children and hand craft. On the other hand Ambedkar craved for modern education for the women, redemption from oppression of male-dominated society over the women. He fought for the equal rights of women and men. It may be summed up that regarding the approach to women Ambedkar started there exactly where Gandhiji ended.

Keyword: Gandhi, Ambedkar, Mirabehn, Ramabai, Hindu Code Bill, Marriage and Divorce, Women's Property, Brahminism

।।এক।।

> "The outstanding impression my mother has left on my memory is that of saintliness. She was deeply religious. She would not think of taking her meals without her daily prayers." (১)

-একথা গান্ধিজি (১৮৬৯- ১৯৪৮) তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর মাতা ছিলেন সাধ্বী ও ধর্মভীরু রমণী। পরিণত বয়সেও সেই স্মৃতি তাঁর মনে উজ্জ্বলভাবে গভীর রেখাপাত করে গেছে। পূজাপাঠ না করে তিনি কখনো অন্ন স্পর্শ করতেন না। গান্ধির অহিংস আন্দোলনের অলিখিত ভূমিকা রেখে গেছেন তাঁর মাতা পুতলীবাই। গান্ধির স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল অহিংস। অনশন পালনকে তিনি সেই সংগ্রামের অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেছেন। জীবনে অনেকবার তিনি অনশন পালন করেছেন। সেই অনশনের মূলে ছিল ব্রহ্মচর্যের শক্তি ও তপস্যা। শিশুকাল থেকে মায়ের ব্রত পালনের মহনীয়তা দেখে এসেছেন গান্ধিজি। আর সেই অন্তঃস্থিত প্রেরণাশক্তিই যৌবনে সত্যমূর্তি লাভ করেছিল। আদর্শ রমণীর অনুপ্রেরণাতেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি।

অপরপক্ষে ড. আম্বেদকর (Bhimrao Ramji Ambedkar, ১৮৯১-১৯৫৬) নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামজি মালোজি সকপাল (Ramji Maloji Sakpal) এবং মাতা ভীমাবাঈ (Bhimabei) সুরবাদকর সকপাল। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন তিনি মাকে হারিয়েছেন। তিনি ছিলেন চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। মায়ের মৃত্যুর সময়ে তাঁর মাত্র দুই ভাই ও দুই বোন বেঁচে ছিলেন। আম্বেদকরের পিতা তাঁর জন্ম তারিখ নথিভুক্ত করে রাখেন নি। ফলে তাঁর সঠিক জন্মদিন জানা যায় নি। জন্ম মুহূর্তে তাঁর মা বড্ড বেশি কষ্ট পাচ্ছিলেন। জ্যোতিষী এ সময় আকাশের তারা দেখে বলেছিলেন, তাঁর মা খুব শীঘ্রই মারা যাবেন। এ কারণে তাঁর ভাইবোনেদের কাছে তিনি নিজে হয়েছিলেন চক্ষুশূল। তাঁর মা বেশি দিন বাঁচেন নি। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা পুনরায় বিবাহ করেছিলেন। এ ঘটনায় বালক আম্বেদকর অখুশি ছিলেন। সৎ মায়ের গায়ে আপন মায়ের অলংকার দেখে

তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এমন কি তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতলবও এঁটেছিলেন।একটি মিলে কাজের সন্ধানও করেছিলেন তিনি। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। অবশেষে তিনি স্থির করলেন, তিনি লেখাপড়া শিখবেন। অস্পৃশ্য মাহাদ পরিবারের সন্তান আম্বেদকর নয়-দশ বৎসর বয়সি বালিকা রমাবাইকে (Ramabai) বিবাহ করলেন। তখন তিনিও অপ্রাপ্ত বয়স্ক। আম্বেদকরের বয়স ছিল মাত্র সতেরো বৎসর। ১৯৩৫ সালে রমাদেবীর মৃত্যু হয়। ১৯৪৮ সালে তিনি বোম্বাই শহরের এক সারস্বত পরিবারের ব্রাহ্মণ রমণী ড. সারদা কবীরকে বিবাহ করেন। নারী সম্পর্কে তাঁর ধারণা কেমন ছিল? জীবনভোর তিনি নারী প্রগতির কথা ভেবেছেন। নারী সম্পর্কে তাঁর স্মরণীয় উক্তিঃ -"I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."[২] – অর্থাৎ আমি একটি সম্প্রদায়ের অগ্রগতির পরিমাপ করি, নারী সম্মিলিতভাবে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা দিয়ে। তিনি আরও বলেছেন, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হবে বন্ধুর-

> "The relationship between husband and wife should be one of closest friends."[৩]

।।দুই।।

গান্ধিজিও বালিকা বিবাহ করেছিলেন। কস্তুর তখন ছিলেন অপরিণত, কিশোরী। বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠেন নি তিনি। সেই বয়সে এমন অপ্রাপ্ত বিবাহের মধ্যে তিনি কোন অন্যায় খুঁজে পান নি। তাছাড়া অল্প বয়সে বিবাহের আসক্তিও তাঁর বেশ প্রবল ছিল। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাও তাঁর ছিল। তিনি পত্নী কস্তুরের উপরে স্বামী সুলভ প্রভুত্ব খাটাতেন। মহাত্মাজি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ 'The Story of my Experiments with Truth An Autobiography' –গ্রন্থে লিখেছেন –"We were the same age. But I took no time in assuming the authority of a husband."[৪] প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, গান্ধিজি কি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পোষণ করতেন? হয়তো তাই। আমৃত্যু তিনি কি বহন করেছিলেন এমন মানসিকতা? স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তিনি আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই নারীকে আন্দোলনের বৃহত্তম পটভূমিতে যুক্ত করেছেন। তখনও কি গান্ধি পুরুষতন্ত্রের নিজস্ব মেজাজ বজায় রেখেছিলেন? নাকি কোন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মনোবীজ তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছিল? যাকে আমৃত্যু উপেক্ষা করতে পারেন নি দেবোপম এই মানুষটি। গান্ধি তো দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। পৃথিবীতে যে কয়েকজন হাতে গোনা মানুষ ধাপে ধাপে শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিশীলিত করে মহাজ্ঞানী-মহামানবে উন্নীত হয়েছিলেন গান্ধি তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন। তা সত্ত্বেও নারী-মুক্তি আন্দোলনে তিনি অসম্পূর্ণ রইলেন কেন? তাঁর

অহিংস আন্দোলনের আলোকজ্যোতি পৃথিবীবাসী স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তা নারীকে সেই পূর্ণ মুক্ত জ্যোতিতে অবগাহন করাল না কেন?

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও কেনই বা তিনি বারবনিতাদের মানবিক মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখলেন না। এমন রমণীদের কেনই বা তিনি কংগ্রেসে অংশগ্রহণের (বরিশাল,১৯২০) পথকে রুদ্ধ করলেন? কেনই বা তিনি নারীর কর্মজগৎকে মূলত গৃহ সংসারের সামান্যতার মধ্যে আবদ্ধ রাখলেন? নারীকে তিনি কি কেবল সুশীলা রেখেই ক্ষান্ত হলেন? তিনি তো নিজে আন্তর্জাতিক মানুষ। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক সাধনপথের সিঁড়ি কেনই বা তিনি নির্মাণ করলেন না? এসব সঙ্গত প্রশ্ন সামনে রেখেই গান্ধিজির নারী দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করা সম্ভব।

নারীমুক্তি প্রসঙ্গে কেন খণ্ডগ্রাস গ্রহণ লেগে রইল গান্ধির জীবনে? লক্ষনীয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীকে পুরুষের সমান সমমর্যাদায় অংশগ্রহণের সুযোগ গান্ধির অনুমতি ক্রমেই ঘটেছিল। এমনকি তাঁর হাত ধরেই ভারতীয় জাতীয় কংগেসের সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন সেদিনের উচ্চশিক্ষিত নারী। গান্ধির প্রশস্ত দক্ষিণ হস্তের স্নেহচ্ছায়া না থাকলে তা কখনোই সম্ভব হত না। সমকালে ডাণ্ডি অভিযানে, লবণ আইন ভঙ্গের প্রাক্কালে, কি অহিংস সংগ্রামের মিছিলে নারীর স্বচ্ছন্দ পদচারণা গান্ধির স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছাড়া সম্ভব ছিল না।

গান্ধির ব্যক্তিগত জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে রমণী বড় ভূমিকা নিয়েছে। স্ত্রী হিসেবে রমণী পুরুষের হৃদয়রত্ন। সৌজন্যবশত গান্ধি বলেছেন, 'man's better half.'। কিন্তু জন্মমুহূর্ত থেকে শিশুকন্যা পুত্র সন্তানের মত পরিবারে স্বাগত সম্ভাষণ লাভ করেন না। নারী আইনগতভাবে স্বীকৃত অধিকারগুলিতেও সামাজিক ন্যায় পরায়ণতা অর্জন করতে পারেন না। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পুষ্ট পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ বড্ড একচোখা। গান্ধি 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত (Harijan, 18 Aug. 1940, CWMG, Vol. lxxii, PP. 378-81)- 'Sevagram' (13 August, 1940) একটি রচনায় লিখেছেন- "Woman is described as man's better half. As long as she has not the same rights in law as man, as long as the birth of a girl does not receive the same welcome as that of a boy, so long we should know that India is suffering from partial paralysis. Suppression of woman is a denial of ahimsa. Every village worker will, therefore, regard every woman as his mothar, sister or daughter as the case may be, and look upon her with respect. Only such a worker will command the confidence of the village people."[৫]

গান্ধিজির জীবনে নারী ভাবনার দু'টি স্পষ্ট পর্যায় লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তাঁর বাল্যকাল, কিশোরকাল, বিবাহিত জীবন এবং যৌবন সময় পর্যন্ত। এই সময়কালে তিনি মাতার আদর্শকে অনুসরণ করে নারী পুরুষের সম্পর্ক অনুধাবন করেছেন। নারীর উপর

পুরুষের প্রভুত্ব যে সহজাত, একথা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লালন করেছেন। পত্নী কস্তুরের উপর স্বামীসুলভ প্রভুত্ব প্রকাশ করেছেন। কস্তুর নিজেও এই অবহেলা বুঝেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রমণীকে গৃহের সীমানা থেকে বহির্জগতের কর্মক্ষেত্রে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছেন। নারীর সভাসমিতি পরিচালনা, কোন কালা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশগ্রহণ তাঁরই প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় ঘটে গেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অহিংস সত্যাগ্রহে বালিকা বা কিশোরী থেকে প্রৌঢ়া রমণীর অংশগ্রহণ বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। এছাড়া বালিকাদের (The Girl Child) ভিন্ন ভিন্ন নানা সমস্যার প্রতি আলো ফেলেছেন তিনি। এগুলির মধ্যে বাল্যবিবাহই প্রধান। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, বাল্যবিবাহের সমর্থনে তিনি কোন নৈতিক যুক্তি খুঁজে পান নি – "I can see no moral argument in support of such a preposterously early marriage."[৬] ভারতীয় সমাজে পুত্রসন্তানের মত কন্যাসন্তানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের রীতি মেনে অল্প বয়সেই বালিকাদের বিবাহ দেওয়া হয়। সেটাই হল সমাজ অনুমোদিত। বালিকা এমন শৈশব বিবাহের বেনোজলে ডুবে যায়। সেক্ষেত্রে বালিকাকে অপরিণত মাতৃত্বের ভার বহন করতে হয়।

গান্ধিজি শাস্ত্রানুমোদিত বাল্যবিবাহকে সমর্থন না করলেও তাঁর প্রতিবাদ তত প্রখর ছিল না। এমন সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন না। অপরপক্ষে, ড. আম্বেদকরও বালিকা বিবাহ করেছিলেন। সমকালের দুই মহাপুরুষ হলেন মহাত্মাজি এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর। একই সময়ে দু'জনেই নারীকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করেছেন। দু'জনেই নারীকে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ কর্ম-উপবনে সৃষ্টিশীল হতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। দু'জনেই ভারতবাসীকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন একটা স্বপ্নের সবুজ দ্বীপভূমিতে। কিন্তু দু'জনেই দুই পৃথক নৌকাতে যাত্রা করেছেন। দুই কর্মযোগীর মানস স্বাস্থ্য এরকম ছিল না। জন্মসূত্রে বিশেষত ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নে দুই মহাজীবনের জীবন চরিত ভিন্নধর্মী ছিল। প্রায় একইকালে জন্মগ্রহণ করলেও সমাজ-পরিবেশ দু'জনের ক্ষেত্রে একরকম সহায়ক ও অনুকূল হয়ে ওঠে নি। নারীর অধিকার আন্দোলনের প্রশ্নেও দু'জনের মতান্তর ছিল স্পষ্ট। কর্ম পদ্ধতির ধারায় দু'জনে সহমত ছিলেন না অনেক ক্ষেত্রে। স্পৃশ্য - অস্পৃশ্য প্রশ্নে দু'জনের দৃষ্টিকোণ ছিল একান্তই স্বতন্ত্র।

একজন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক প্রাচীর ডিঙিয়ে পৃথিবীবাসীকে সংগ্রামের অহিংসা মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। জৈনধর্মের তীর্থঙ্কর মহাবীর, বৌদ্ধধর্মের ভগবান বুদ্ধের মত তিনিও সমকালে মিথ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এক মহত্তর জ্যোতির্ময় পুরুষ। অহিংসার আলোকরাশিকে সমাজ ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লেষিত করেছেন। মানব হৃদয়ে আধ্যাত্মিক সত্যের দিব্য জ্যোতিপুঞ্জকে সংগ্রামের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। অহিংসা দিয়েই তিনি অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ মুক্ত বাস্তব পৃথিবী মানব সমাজকে উপহার দিতে

চেয়েছেন। স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া করুণাময় ঈশ্বরের ব্রহ্মচারী দূত তিনি। অনেক পথশ্রমেও ভারতীয় নারীর চিরন্তনী রূপ তিনি ভোলেন নি। নারীর কর্মক্ষেত্র নির্বাচনে দেশ-কাল-ঐতিহ্য উত্তরাধিকারকে পাথেয় করেই তিনি এগিয়েছেন।

।।তিন।।

ড. বাবা সাহেব আম্বেদকর। নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শূদ্র তিনি। জন্মসূত্রেই পরিশীলিত সমাজে ছিলেন ব্রাত্য। সমকালে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুশাসনে অস্পৃশ্য নারী হয়ে উঠেছিলেন সমাজের বোঝা। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, মহর্ষি মনুর কাল থেকে নারীকে দাসীরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। নারী মুক্তির পথে বড় বাধা হল অস্পৃশ্যতা। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিরা অস্পৃশ্যতাকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। পল্লির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তিক প্রদেশে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারগ্রস্ত অসূর্যম্পশ্যা ব্রাত্য নারীর অবস্থান যে কেমন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ড. আম্বেদকরের মুখ্য কথা হল, অস্পৃশ্য নারীর সমষ্টিগত মুক্তি। উচ্চবর্গীয় রমণীকুল সমাজে যে অধিকার এবং মর্যাদা লাভ করে নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য শূদ্র রমণীর তা ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে নিম্নবর্গীয় রমণীকে শোষণ, অত্যাচার এবং বঞ্চনার ভার বহন করতে হয়েছে। আম্বেদকর মনে করেছেন, নিম্নবর্গীয় রমণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই সুস্থ সমাজের জন্ম হবে। তিনি ১৯২৭ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর মাহাদ নামক স্থানে নিম্নবর্গীয় রমণীদের লেক থেকে জল তোলার অধিকারকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত উক্ত লেকে নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের জল তুলতে বাধা দেওয়া হত। সেজন্যই তিনি দলিতদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এবং নিম্নবর্গীয় রমণী সমাজকে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে সামিল করেছিলেন। আম্বেদকর উক্ত সভা থেকে বলেছেন, মাহাদের এই লেক জনসাধারণের নিজস্ব সম্পদ। তা কেবল বর্ণ হিন্দুদের নয়। আমরা যে চাভাদ লেকের জল পান করলেই অমর হয়ে যাব, তা নয়। আমরা সেখানে যাচ্ছি এই সত্য উপস্থাপিত করার জন্য যে, আমরা অন্যদের মতই মানুষ। স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, সমতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এই সভা আহ্বান করা হচ্ছে-

> "This water lake of Mahad is a public property. ....Our objective is to prove that we are the human beings just like others. Therefore, this Conference is arranged to lay a foundation for establishing the social equality."(৭)

গান্ধি এবং ড. আম্বেদকর সমকালের দুই যুগন্ধর পুরুষই নারীকে সামাজিক সংগ্রাম এবং অধিকারবোধক আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন। তবুও গান্ধি নারীকে দেখতে চেয়েছিলেন চিরন্তনী ভারতীয় ঐতিহ্যের পটভূমিতে। গান্ধি নারীর মধ্যে দেখেছেন ত্যাগের মহতী ঐশ্বর্য, সহ্যশক্তির কঠোরতা এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা। সংযম এবং সেবার প্রতিমূর্তি নারীই গান্ধির দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে বারংবার। তাঁর কাছে নারী ছিলেন পুরুষের যোগ্য

সহযোগী। কিন্তু গান্ধি যখন ১৯১৫ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, তখন নারীকে অন্য ভূমিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামে সামিল করলেন। এবং পাশাপাশি সংগ্রাম ক্ষেত্রের বাইরেও নানা সামাজিক কাজকর্মে তিনি সম্পৃক্ত করলেন। নারীর পূর্ণ স্বকীয় নারীসত্তা উদ্ভাসিত হল।

গান্ধি এবং আম্বেদকর দু'জনেই নারীকে সামাজিক অগ্রগতির সূচকরূপে দেখেছিলেন। কিন্তু গান্ধির দৃষ্টিতে নারী যেখানে তাঁর যাত্রা শেষ করেছেন, আম্বেদকরের নারী সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছেন। আম্বেদকর নারীর ভূমিকাকে সমাজের নানা বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে পল্লবিত করেছেন। তাঁর অস্পৃশ্য সংগ্রামী নারী প্রগতির বহু যোজন পথ অতিক্রম করেছেন। আম্বেদকর নারীর ব্যক্তি সত্তার থেকে সমষ্টি-চেতনাকে মূল্য দিয়েছেন বেশি। তাঁর নারী মাহাদের লেকে,পানীয় জলের আন্দোলনে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে, অন্ধকার খনিতে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠায়, এমনকি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, সম্পদের অধিকারে এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনে আন্দোলন করেছেন। তবুও গান্ধি যেন ঠিক বোশেখের সন্ধ্যাকালীন আকাশ। তপ্ত দুপুরের ভয়াবহ দাবদাহ আপনার মধ্যে গভীর যন্ত্রণায় গোপন রেখেছেন। পৃথিবী ব্যাপী হিংসার মধ্যে অহিংসার শান্ত প্রদীপ জ্বেলেছেন তিনি। আর আম্বেদকর চৈতি ভরদুপুরের আগুনে গোলার প্রতিকূল প্রহরে হেঁটে চলেছেন। একাকী তিনি। সমাজ দেহের সর্বত্রই শুষ্ক-শূন্যতার ছবি। কোথাও করুণার সামান্য বিন্দু বিসর্গও নেই। দুই মহাযাত্রিকের মনে-মননে, কর্ম প্রকরণে-দু'রকমভাবেই নারী অনন্য হয়ে উঠেছেন। দু'জনেই যেন ঠিক কোন সবুজ দ্বীপের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। কিন্তু তাদের যাত্রা পৃথক পৃথক নৌকায়।

বিবাহিতা নারীর সমস্যা নিয়ে আম্বেদকর ভেবেছেন সবথেকে বেশি। আম্বেদকর মনে করেছেন, নারীর সমস্ত সমস্যার মূলে আছে- অশিক্ষা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নারীকে শিক্ষার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তাঁর মতে, নারীর যথার্থ মুক্তি হতে পারে শিক্ষার দ্বারা। কোন কিছুই নারী-শিক্ষার কোন বিকল্প হতে পারে না। অন্ত্যজ রমণীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, শিশুকন্যাকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে – "You should educate your daughters as well. Knowledge and education are not for men only. It is necessary for women too. If you wish to reform your next generation, you must give education to girls as well."[৮] শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই আম্বেদকর কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ব্যবধান জনিত গভীর তলদেশের শেকড়কে সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছেন।

শিক্ষাকে পাথেয় করে বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধিজিও। কিন্তু গান্ধি যেখানে ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করে নারী প্রগতির কথা ভেবেছেন, সেখানে

আম্বেদকর ভারতীয় ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কুটিল কীটকে প্রত্যক্ষ করছেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র মনুষ্যত্বের বিবেককে কুরে কুরে খেয়েছে। নিম্নবর্গীয় মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে অস্পৃশ্যতার গুরুভার বোঝা। তাঁর মতে, অস্পৃশ্যতার উত্তরাধিকার ভারতীয় সমাজকে গৌরবান্বিত করে নি। বরং অস্পৃশ্য মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে একরাশ দুরূহ কলঙ্কের ভার। গান্ধিজি যেখানে ভারতীয় রমণীদের আদর্শ হিসেবে সীতা, দয়মন্তী এবং দ্রৌপদীর সপ্রসঙ্গ আখ্যায়িকাকে স্মরণ করিয়ে দেন, আম্বেদকর সেখানে 'হিন্দু কোড বিল' ('Hindu Code Bill') আইনের নতুন নতুন অনুসিদ্ধান্তের খোঁজে গভীর নিষ্ঠায় বইয়ের পর বইয়ের পাতা উল্টান। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের চিরপূজ্য ঐতিহ্যাশ্রয়ী নারী চরিত্রগুলির সপ্রশংস উপস্থাপন তাঁর বক্তৃতায় মেলে না।

গান্ধিজি যখন বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়তেন তখন অনেক উচ্চশিক্ষিতা রমণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অহিংস সত্যাগ্রহী রূপে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই রমণীরা ছিলেন তৎকালীন ভারতীয় সমাজের অতি উচ্চবিত্ত কিংবা জমিদার ভূস্বামীদের উত্তরাধিকারিণী। অনেকেই পড়ন্ত জমিদার বংশের কন্যা। কিংবা তৎকালীন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কোন নেতার পত্নী। উচ্চ-শিক্ষিতা এই রমণীরা গান্ধিজির সংস্পর্শে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা তথা তৎকালীন লাহোরের কংগ্রেস নেতা রামভুজ দত্তচৌধুরীর পত্নী সরলা দেবী চৌধুরানী। এছাড়া গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে ১৯১৭ সালে যে সত্যাগ্রহী মহিলা বাহিনী গঠন করেছিলেন, সেই বাহিনীতে ছিলেন আনন্দীবাই, অবন্তিকাবাই-এর মত শিক্ষিতা রমণীরা। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সহযোদ্ধা রূপে তিনি পেয়েছিলেন সরোজিনী নাইডুকে (১৯৭৯-১৯৪৯)। বিলেত শিক্ষিতা এই রমণী গান্ধির পরামর্শ ক্রমেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে গান্ধিজির সঙ্গে ডাণ্ডি অভিযানে তিনি প্রায় দু'শ মাইল পথ হেঁটেছিলেন। অবশেষে ইংরেজ সরকার গান্ধিজিকে গ্রেপ্তার করলে সরোজিনীই উক্ত অভিযানের নেতৃত্বভার নিজের মাথায় গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধির নেতৃত্ব প্রসঙ্গে সরোজিনীর শ্রদ্ধামিশ্রিত উক্তি ছিল- "Gandhiji's body is in jail but his soul is with you."[৯] এছাড়াও উল্লেখযোগ্য রমণীরা হলেন গঙ্গাবেন, মণিবেন, সুশীলা নায়ার প্রমুখ। আর সেই ইংরেজ কন্যা মাডলিন স্লেড (Madeleine Slade, 1892-1982) আপন মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর ভারতবর্ষে। ১৯২৫ সালের ১৬ ই নভেম্বর প্রায় ৩৩ বৎসর বয়স্কা এই তরুণী রোম্যাঁ রোল্যাঁর লেখা গান্ধি জীবনী (Mahatma Gandhi) পড়ে চলে এসেছিলেন সবরমতী আশ্রমে। গান্ধিজি তাঁর নাম রেখেছিলেন মীরা বেন (Mira Behn)। ভগিনী নিবেদিতা তবুও ভারতবর্ষে আসার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন, মীরা বেন কিন্তু গান্ধিকে দেখেন নি। কেবল ছোট্ট বই পড়ে হৃদয়ভাবের এমন প্রবল পরিবর্তন কমই পাওয়া যায়। এই মীরা বেন ১৯৪২ সালে

গান্ধির 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' (Quit India Movement, 1942) অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও গান্ধির কর্মজীবনের শেষপর্বে ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে হিন্দু মুসলমানের ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে তিনি সুচেতা কৃপালিনী, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতি রমণীকে সহযোগী হিসেবে লাভ করেছিলেন। যারা শিবির স্থাপন করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নির্যাতিত রমণীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। গান্ধির নির্দেশে মহিলারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতে স্থান লাভ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী বাসন্তী দেবী। ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী হন তিনি। এছাড়া কুমিল্লার হেমপ্রভা মজুমদার স্বদেশী বক্তৃতায় সাধারণ মানুষকে মোহিত করেছিলেন। আর বৃদ্ধা মোহিনীদেবী খদ্দরের শাড়ি পরে স্বদেশী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করতেন। দেখা যাচ্ছে সেকালের উচ্চ-বিত্ত পরিবারের শিক্ষিত রমণীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধির সহযোদ্ধা রূপে কাজ করেছেন।

।। চার ।।

অপরপক্ষে, আম্বেদকর নিজে জন্মসূত্রে ছিলেন অন্ত্যজ পরিবারের সন্তান। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ-শিক্ষা শেষ করার পরে তিনি যখন দেশে ফিরলেন, তখন কোন উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভারতীয় তাঁকে কোন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে আসেন নি। সেই আম্বেদকর, ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরে তিনি অধ্যাপনার কাজে রত হলেন। সেদিনও সহকর্মীরা এই তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে একই শ্রেণিকক্ষে বসতে রাজি হননি। তিনি কেবল জন্মসূত্রে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের – তাঁর অপরাধ ছিল এইটুকু। সুতরাং কোন উচ্চবর্গীয় শিক্ষিত রমণীকে সহযোদ্ধা হিসেবে তিনি পান নি। কোন সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে তাঁকে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসেন নি। অবশ্য দ্বিতীয় বিবাহের পরে তাঁর সহধর্মিণী ব্রাহ্মণকন্যা তাকে সাহায্য করেছিলেন। ১৯২৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তিনি মাহাদের চাভাদর লেক থেকে দলিতদের জল নেওয়ার জন্য যে আন্দোলন করেছিলেন, সেখানে পুরুষদের সঙ্গে উপস্থিত রমণীরাও যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলেন। এঁরা ছিলেন নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসংখ্য জনসভায় তিনি বক্তব্য রেখেছেন। সেই সব জনসভায় উপচে পড়া ভিড়ের আনাগোনায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এই রমণীরা ছিলেন নিম্নবর্গীয় নিরক্ষর। তাঁর প্রায় প্রতিটি জনসভায় রমণীদের এমন উপস্থিতি সমস্ত সভাস্থলকে একটা গণআন্দোলনে পরিণত করত। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নারীকেন্দ্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুশাসনের দুঃসহ ফল ভোগ করতে হয়েছে নিম্নবর্গীয় রমণীদের। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নিম্নবর্গীয় আম্বেদকর যখন বিদেশ থেকে ভারতে ফেরেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের সুবিধাভোগী শ্রেণি চরিত্র সম্পন্ন শিক্ষিতদের দলে ভিড়ে স্রোতের অনুকূলে গা ভাসান নি। বরং তিনি ভারতবর্ষের নিরন্ন নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য অসূর্যম্পশ্যা রমণীদের সংগঠিত করে সমাজ সংস্কারের কাজে নতুন মাত্রা এনেছিলেন। আম্বেদকর তাঁর

সমাজ সংস্কার শুরু করেছিলেন, সমাজের গভীরে শেকড় বিস্তার করা কুপ্রথাগুলির সমূল উচ্ছেদের মাধ্যমে। নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ রমণীদের সহযোদ্ধা হিসেবে মর্যাদা দিয়ে তিনি সংস্কার আন্দোলনকে গতিশীল করেছিলেন। ১৯২৭ সালে মাহাদে অস্পৃশ্য নারীর জল তোলাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, তাই তাঁকে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের মানুষের নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। Vasant Moon তাঁর 'Dr. Babasaheb Ambedkar' – গ্রন্থে মাহাদ আন্দোলনকে দলিত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন –

> "The Mahad Conference was not an Ordinary Conference; it was a propitious launching of the "Dalit" revolution. It was the beginning of a new age in the social and political life of India. It was the first time when the "Dalit" Started a direct action." (১০)

একথা ঠিকই, এই আন্দোলন নিম্নবর্গীয় মানুষের মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খলকে প্রথম ভেঙে উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে প্রথম ঝাঁকুনি দিল।

নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য হিন্দু রমণীদের শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বহন করা কুসংস্কারের বোঝাকে শেকড় শুদ্ধ সমূলে উৎখাত করতে আম্বেদকর একপ্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অস্পৃশ্যদের ভার বহনকারী রমণীদের উদ্দেশ্য তিনি পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার গুরুত্ব বুঝিয়ে ছিলেন। স্বামী পুত্রকে নেশা থেকে দূরে থাকার দায়িত্ব পালনের কথা বলেছেন। আর বলেছেন, (২০শে আগস্ট, ১৯২৭) সন্তানকে সুশিক্ষিত করার কথা –

> "Observe cleanliness. Dress like the caste women do. If your sons and your husbands come home drunk, do not let them enter the house. Educate your children." (১১)

কনফারেন্সে এমন ভাষণ দেওয়ার পরের দিনের সভাতে এই নিম্নবর্গীয় রমণীরা এসেছিলেন। তবে তাদের পরণে পরিধেয় ছিল ধৌত পরিচ্ছন্ন পোশাক। আম্বেদকরের তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণের ফলে দলিত রমণীর মুক্তির আন্দোলন সেদিন থেকে যথার্থই এক নতুন যুগ সূচিত হয়েছিল। আম্বেদকরে এই আন্দোলন ভারতীয় ইতিহাসের এক নতুন পাতা খুলে দিয়েছিল। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যাত্রার প্রাক্কালে এক সহযাত্রিকের কথায় তা স্পষ্ট – "This young man is writing the new pages of Indian History."(১২) শূদ্র জাগরণ এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। আম্বেদকর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহাবোধি পত্রিকার একটি আটিক্যাল – এ লিখেছেন – বৌদ্ধ শাসকের সময়কালেও হিন্দু রমণীর শাসনের অধিকার ভোগ করতেন কিন্তু তাঁর পরে তারা মহর্ষি মনুর দ্বারা অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছিলেন। বাবাসাহেব ১৯৫১ সালে মহাবোধির ম্যাগাজিন (Mahabodhi Magazine, 1951), 'Rise and fall of Hindu

Women – শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেছেন – "The freedom which Hindu women enjoyed during Buddhist period was annihilated by Manu."[১৩] ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুদার অনুশাসনে অন্ত্যজ হিন্দু রমণীরা মননে এবং কর্মে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে যে দাসত্বের ভার বহন করেছিল, বৌদ্ধধর্মে তা ছিল না। বৌদ্ধধর্মে ছিল অনেকটাই উদার খোলা হাওয়া। পুরুষতন্ত্র থাকলেও নারীকে অসূর্যম্পশ্যা হতে হয় নি। এমন যন্ত্রণার অসহায় ভার বৌদ্ধধর্মে নারীকে বহন করতে হয় নি। বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্ম এই দুই ধর্মের ধর্মাচার্যরা হলেন যথাক্রমে ভগবান বুদ্ধ এবং আচার্য মনু। নারী সম্পর্কে দুই ধর্মের দুই প্রতিনিধির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে স্পষ্ট করেছেন বাবাসাহেব। তিনি লিখেছেন-

> "Buddha allowed women to be Parivrajak or Bhikshuni thereby giving them freedom to acquire knowledge. They were also allowed the means of self advancement. Bhuddha revolutionised the whole community and gave women freedom and dignity. Manu wanted to stop women from joining Buddhism, restricted them in several ways and enslaved them."[১৪]

ভগবান বুদ্ধ এবং আচার্য মনুর মধ্যে ছিল 'আসমান জমি তফাত'। বুদ্ধ যেখানে নারীর স্বাধীনতা এবং মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, মনু সেখানে নারীর অধিকার এবং মর্যাদাকে হরণ করে চোখের আলোটুকুকেও নিভিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সমাজপতিরা নানা অনাচারের জন্ম দিয়ে সমগ্র সমাজদেহকে পূতিগন্ধময় করে তুলেছিলেন। এদের কাছেই নারী হয়ে উঠেছিলেন 'নরকের দ্বার'। নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ রমণীর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। আরও অসহায়-করুণ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা ছিল অবর্ণনীয়। মানবিকতার সামান্য বিন্দু বিসর্গ ছিটে ফোঁটাও এদের হৃদয়বৃত্তিতে বাসা বাধেনি। সামাজিক মানুষ হিসেবে পদে পদে ছিল এঁদের নিষেধাজ্ঞা ও কঠিন অনুশাসন। যাত্রা-অযাত্রা, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, বার-ব্রত, আচার-অনুষ্ঠান, খাওয়া- দাওয়া, চলা-ফেরা- এককথায় জীবন যাপনের পদক্ষেপে পদক্ষেপে ব্রাহ্মণ্য মোড়লেরা মাথা ঘামাতেন। আর তাদের অঙ্গুলি হেলনেই নারী সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মতই জীবনের কলঙ্কভার বয়ে বেড়াতেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অস্পৃশ্য নারী এমন কলঙ্ক চিহ্ন বহন করছে। আম্বেদকর নিম্নবর্গীয় রমণীর কলঙ্ক চিহ্নের স্থানকে চিহ্নিত করে সামাজিক ক্ষতের উপশম করাতে চেয়েছেন। এ জন্য অস্পৃশ্য নারী সমাজকে সংগঠিত করে তিনি নারী মুক্তির আন্দোলনকে সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে চেয়েছেন।

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর দলিত সম্প্রদায়ের রমণী রমাবাইকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের পর শেষ দশ বৎসর তিনি তাঁর পত্নীকে কর্ম ব্যস্ততার কারণে সে রকম সময় দিতে পারেন নি। ১৯৩৫ সালের মে মাসে রমাবাই অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন । আম্বেদকরের কাছে

এটি ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক বিষণ্ণ ঘটনা। তিনি তাঁর পত্নীকে দেখেছিলেন দায়িত্ববোধের প্রতিমূর্তিরূপে। কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন সেবাপরায়ণ রমণী ছিলেন তিনি। কর্মনিপুণ, বিচারবোধসম্পন্না এই রমণী আম্বেদকরের মহতী কর্ম পরিসরকে সম্পূর্ণ করার জন্য অনেক কিছুই উৎসর্গ করেছিলেন। বাড়িতে যারা আম্বেদকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, সেই অতিথিদের তিনিই পরিচর্যা করতেন, সহজ-সরল-অনাড়ম্বর আতিথেয়তায় তাঁদের গৃহ পরিবেশ শোভন সুন্দর হয়ে উঠত। এছাড়া আম্বেদকর ১২ জন দলিত ছাত্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর পত্নী রমাবাই সেই ছাত্রদের নিজের হাতে রান্না করে খাবার প্রস্তুত করে দিতেন। সেবাপরায়ণ এই রমণীর কাজের কোন সময় থাকত না। পরিশ্রমেরও শেষ ছিল না। নিজের বাড়ি এবং পরিবারকে সুচারু রূপে নিয়ন্ত্রণ করার সহজাত দক্ষতা ছিল তাঁর। রমাবাইয়ের মৃত্যুর পর আম্বেদকরের শরীর - স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাঁর কাজের রুটিন এলোমেলো হয়ে যায়। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তিনি নিদ্রাহীন হয়ে পড়েন। নার্ভের পীড়া, হাইব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিসের পীড়ায় তিনি ভুগতে থাকেন। দুই প্রখ্যাত ডাক্তারবাবু তাঁকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু কোন উন্নতি তাঁর ছিল না। ডাক্তারদের পরামর্শ ছিল, তাকে দেখাশোনার জন্য সব সময়ের কাউকে প্রয়োজন। সেই পরামর্শ মেনে তিনি বোম্বাইয়ের মহিলা চিকিৎসক ড. সারদা কবিরকে (Dr. Sarada kabir-1909-2003) বিবাহ করেন। বিবাহের পর আম্বেদকর তাঁর নাম রেখেছিলেন সবিতা আম্বেদকর (Savita Ambedkar)। সত্য সত্যই সেবা, শুশ্রূষা এবং সাহচর্য দিয়ে সবিতাদেবী আম্বেদকরকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর যথার্থ সহযোগী ছিলেন। স্বামীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের প্রাক্কালে সংবিধানের খসড়া রচনার সময়ে, হিন্দু কোড বিল আইন প্রণয়নকালে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা পর্বে এই রমণী আম্বেদকরের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্রাহ্মণ কন্যাকে আম্বেদকর বিবাহ করে সমকালের জাতিভেদ পীড়িত ভারতবাসীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁর 'Inter-marriage' বা আন্তঃবিবাহের উদ্যোগ শুধু কথার কথা ছিল না। তিনি নিজেও এই অসবর্ণ বিবাহ করেছেন। আন্তঃবিবাহ হল ভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিবাহ। সবিতা আম্বেদকর ছিলেন মারাঠি ব্রাহ্মণ কন্যা। উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়। উচ্চ শিক্ষিত এম.বি.বি.এস. চিকিৎসক এই ডাক্তার নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে আম্বেদকরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামস্বামী ভেঙ্কটরামন যখন বাবাসাহেব আম্বেদকরকে সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' তুলে দেন, তখন ড. সবিতাদেবী সেই পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীর নীতির সঙ্গে কোন কিছুর বিনিময়ে তিনি আপস করেন নি। এমন কি কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্যপদের প্রস্তাবকেও তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখান করেছিলেন। জীবনের অন্তিম প্রহরে নিম্নবর্গের দলিত আন্দোলনের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হয়েছিলেন। এই রমণী আম্বেদকরকে ঠিকই বুঝেছিলেন। আর আম্বেদকরও বুঝেছিলেন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের একটি উপায় হল 'অসবর্ণ বিবাহ' বা 'Inter – marriage'। নারীমুক্তি আন্দোলনের এটি একটি বড় ধাপ। অস্পৃশ্য বা স্পৃশ্য,

অন্ত্যজ অব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ, নিম্নবর্গীয় এবং উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থান নিয়েই তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন। দুই রমণী যথাক্রমে রমাবাই এবং ড. সবিতা আম্বেদকরকে কেন্দ্র করেই আম্বেদকরের সমগ্র জীবন আবর্তিত। প্রথমজন তাঁর মহীরুহ সদৃশ চরিত্রে স্থাপত্যের ভিতঘর, দ্বিতীয়জন বিকাশ ও বিবৃদ্ধি। দ্বিতীয়জন তাঁর জীবনটাকে সেবায় শুশ্রূষায় প্রায় সাত-আট বছর সময়কে টেনে টেনে বাড়িয়ে নিয়ে গেছিলেন।

।। পাঁচ ।।

গান্ধি এবং আম্বেদকর - নারী ভাবনার দৃষ্টিতে দু'জন স্বতন্ত্র থেকে গেছেন কর্মে ও চিন্তনে। গান্ধির জীবনের প্রধান ব্রত ও কর্ম ছিল অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। সত্যাশ্রয়ী সত্যাগ্রহীরাই অহিংস আন্দোলনের শরিক হতে পারেন। গৃহচারিণী নারীকে তিনি অহিংস সংগ্রামের পথে সামিল করতে পেরেছিলেন। তবু তিনিই ছিলেন কাণ্ডারী। সমগ্র জাতি তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। নারী সত্যাগ্রহীর সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে অভিনব তাৎপর্যে নতুন মাত্রা দিয়েছিল। অপরপক্ষে, ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর সমাজের বৃহত্তর অংশ শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে মুক্তির আলো দেখাতে চেয়েছিলেন। সামাজিক ভাবে তাঁদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দ্বারা হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নিম্নবর্গীয় নারী সমাজকে সংগঠিত করে সমাজ সংস্কারের সূচিমুখ উন্মোচিত হয়েছিল তাঁর হাতেই।

আম্বেদকর বুঝেছিলেন, সমাজে নারী অলগ্ন থেকে গেছে। নারীর সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেতে হলে তাঁদের পৃথক সংগঠনের প্রয়োজন। তিনি এও মনে করেন, কোন সম্প্রদায়ের প্রগতির পরিমাপ ঐ সম্প্রদায়ের নারীর প্রগতির উপর নির্ভর করে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পাশাপাশি সমানভাবে পুরুষতন্ত্রও নারীপ্রগতির সমূহ সর্বনাশ সাধন করেছিল। বেদের যুগেও বিদুষী রমণীর সন্ধান মেলে। কিন্তু তা সমকালীন সমাজে নারী প্রগতির পরিমাপ জ্ঞাপক আদর্শ সূচক নয়। তা ছিল কোন উদার পিতার কন্যার প্রতি বিশেষ বদান্যতা। এমন দু'একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিলে বলতে হয়, নারীকে পুরুষতন্ত্র দিনের আলোয় রাজপথে মেরুদণ্ড সোজা রেখে হাঁটতে দেয় নি। ইংরেজ শাসনের প্রায় অবসানলগ্নে ড. আম্বেদকর স্বভাবতই নারী সংগঠনের প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৪২ সালের ২০ জুলাই নাগপুরে "All-India Depressed Classes Women's Conference" –এর একটি সভায় 'Progress of the Community is Measured by Progress of Women' – শিরোনামাঙ্কিত একটি বক্তৃতায় বলেছেন –

> "I am a great believer in women's organization. I know what they can do to improve the condition of society if they are convinced. In the cradication of social evils they have rendered great services. I will testify to that from my won experience. Ever since I began to

work among the depressed classes, I made it a point to carry women along with men."[১৫]

অপরপক্ষে, গান্ধিজির স্বদেশী আন্দোলন ছিল নারী শক্তির জাগরণ। রমণীরা স্বদেশী ব্রত পালনের মধ্য থেকে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হবেন। গান্ধিজি তাঁর 'India under British Rule' অধ্যায়ের **১৯১৯** সালের ৮ এপ্রিল- 'Observance of the Swadeshi Vow' রচনায় লিখেছেন- "If a few thousand men and women were to take the Swadeshi Vow in this spirit, others will try to imitate them so far as possible. They will then begin to examine their wardrobes in the light of Swadeshi."[১৬] – একথা। ভারতীয় রমণীদের মধ্যে গান্ধিজি দেখেছেন আত্মত্যাগের মহিমা, ব্রহ্মচর্যের শক্তি। ভারতীয় রমণীরা কষ্ট সহিষ্ণু। সুতরাং তাঁদের কাজ হবে ধাত্রীবিদ্যা আয়ত্ত করা, স্বাস্থ্যবিধি পালন করা এবং সন্তানের যত্ন নেওয়া। রমণীদের দেশজ সংস্কৃতি নির্ভর কর্মসংস্থান বেছে নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন তিনি। আর নারী বুনিয়াদি শিক্ষায় লাভ করবেন। এবং কুটির শিল্পের কাজ হবে তাদের প্রধান অর্থনৈতিক অবলম্বন।

ভারতীয় সমাজ যে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয় না, গান্ধি তা জানতেন। তিনি জানেন, প্রত্যেক নারী পুরুষের সমান অধিকারী। এই অধিকার যেমন স্বামীর অর্জিত অর্থের উপর বর্তায়, তেমনি স্বামীর সম্পদের উপরেও। রমণী তাঁর স্বামীর দাস নয়। তাকে অবলা প্রাণীর দৃষ্টিতে দেখার কোন অধিকার নেই তাঁর। **১৯১৯** সালে ৮ই আগস্ট 'Hindi Navajivan' পত্রিকায় 'A woman's Status in marriage' শিরোনামাঙ্কিত চিঠিতে গান্ধিজি নারী বিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান কথা লিখেছেন –

i) .....There is no doubt that a man who treats his wife like an animal who considers her as his property cuts himself from his better half."
ii) A wife is never to be considered her husband's slave, nor merely meant to be the object of his lust. She has a right to the same freedoms which the husband wants for himself."
iii) It is my firm belief that a wife has full right to her husband's earning. She has an inalienable right to his property.[১৭]

ভারতীয় সমাজে নারীর সম্পর্কে এ সমস্ত অবহেলার কথা লিখেও গান্ধিজি নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহাবস্থানের কথা বলেছেন। - "The World cannot go on without either the men or the women, it can go on only by their mutual co-operation."[১৮] অনুরূপে **১৯৩১** সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 'Daily Herald' পত্রিকায় গান্ধি

বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সমতার অধিকার রমণী অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু গৃহ সংসারের নারী রাণীর মহিমায় ভূষিত। গৃহ পরিবেশকে তিনি আদর্শ সুখী নীড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমন আদর্শ ঘর সংসার মাতা ও সন্তানের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার প্রকৃত ঠিকানা। পারিবারিক গৃহক্ষেত্রই নারীর আদর্শ বিচরণ ক্ষেত্র। তিনি এমনও বলেছেন – '...but for the mass of the people the preservation of home life is essential."[১৯] নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গান্ধিজি কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগেন না। তিনি কোন আপস বা সমঝোতা করেন না। তিনি মনে করেন ছেলে এবং মেয়েরা সমাজে সমান ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯২৯ সালের ১৭ই অক্টোবর 'Young India' পত্রিকায় তিনি 'Women's rights' শিরোনামের একটি রচনায় লিখেছেন - "..... But I am uncompromising in the matter of women's rights. .... I should treat daughters and sons on a footing of perfect equality."[২০] গান্ধির কাছে নারী ত্যাগ এবং দুঃখ বহনের মূর্তরূপ – "Women is the embodiment of Sacrifice and Suffering."[২১]

দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি দেখেছেন সামাজিক কাজে উদ্দীপিত নারী সমাজকে। ১৯১৩ সালের ১৪ মার্চের এক রায়ে বিচারপতি মি. সারলে (Mr. Justice Searle) সরকারী অফিসে রেজিস্ট্রি ছাড়া কোন ভারতীয় রীতির বিবাহকে স্বীকৃতি দিলেন না। ঐ রায়ের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহী সংগঠনের মহিলারা আন্দোলন করেছিলেন। টলস্টয় ফার্মের (Tolstoy Farm) – এর মহিলারাও ঐ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। গান্ধিপত্নী কস্তুরবাই সহ ষোলজন নারী জেলবন্দি ছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই রমণীরা এমন সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি যখন মহিলা সত্যাগ্রহী বাহিনী গঠন করলেন, সেখানে আনন্দীবাই, অবন্তিকা বাইদের মত উচ্চশিক্ষিত রমণীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী গান্ধিজি গুজরাটে মহিলাদের একটি কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাজকে রামরাজ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গান্ধির মতে, স্বরাজ হল আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-rule or Self Control)। স্বরাজ লাভের উপায় হল অহিংস-অসহযোগ (Passive Resistance), আত্মিক শক্তি (Soul force) বা ভালবাসার শক্তি (love force)। দুঃখ - যন্ত্রণা বরণ না করে কোন জাতি স্বরাজ লাভে সমর্থ হয় না। স্বরাজ লাভ করতে হলে আত্ম-নির্ভর বা স্বদেশী ভাবনার প্রয়োজন। গান্ধিজি তাঁর 'Indian Home Rule (Hind Swaraj)' গ্রন্থে বলেছেন –

1. "Real Home rule is Self-rule or Self-Control.
2. The way to the passive Resistance: that is soul force or love force.
3. In order to exert this force, Swadeshi in every sence is necessary.[২২]

গান্ধিজি সমগ্র নারী সমাজকে এমন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ১৯২৫ সালের মহিলা সমাবেশে তাঁর আহ্বান –

> "Even if we did, I would have no use for that kind of Swaraj to which such women have not made their full Contribution. One could well stretch oneself on the ground in obeisance to women of purity of mind and heart. I should like such women to take part in Public life."(২৩)

তিনি নারীকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হতে বলেছেন। তিনি মনে করেন, ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তানের সাহচর্যময় পরিবেশ নারীর কাজের আদর্শ ক্ষেত্র। রমণী গৃহ সংসারের কর্ত্রী। কিন্তু নারী অসূর্যম্পশ্যা নয়, তিনি গৃহবন্দি থাকতে পারেন না। তাঁর রয়েছে জনগণের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত মহতী কর্ম। সমষ্টিগত এমন স্বার্থ রহিত কাজের জন্য নারী হয়ে ওঠেন মহীয়সী। ১৯২৪ সালের ২৪ শে মে – এর এই শিরোনামাঙ্কিত 'The Purity of women in public life'- রচনায় গান্ধি নারী সমাজকে অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের মহতী অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন –

> "A women has a right to go out of her home in order to serve, it is her duty to do so. As day by day women come to take greater part in our movement, we shall see-more and more men and women coming together in meetings. This seems to me quite a normal situation."(২৪)

গান্ধি বাল্যবিবাহকে নির্মম পাশবিক প্রথা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছে এই প্রথা –"a brutal custom'.(২৪.ক) ১৯২৫ সালে ২৪শে জুন 'নবজীবন' পত্রিকায় একটি রচনায় গান্ধিজি লিখেছেন – "The Custom of child marriage is a moral as well as a physical evil."(২৪.খ) বাল্যবিবাহকে ক্ষতিকর বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করার পক্ষেই তিনি মত দিয়েছিলেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধিচরিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং দোলাচলতা ছিল। নারী প্রগতির অনেকগুলি ক্ষেত্রে তাঁর পশ্চাৎমুখীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিধবা রমণীর বিবাহের ক্ষেত্রে এমন দোলাচলতা ছিল স্পষ্ট। বালিকা বিধবার বিবাহে তাঁর সম্মতি ছিল। কিন্তু বয়স্কা রমণীদের বিবাহকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। এমন কি বিবাহের ক্ষেত্রে জাতি সত্তাকেও মান্যতা দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় সমাজের অনুকূলে একধরনের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাকে তিনি লালন করেছেন। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে পিতা মাতা এবং পিতৃবন্ধুদের তিনি দেখেছেন। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে পুরুষ প্রাধান্য হয়তো তাঁর ধমনিতে

ধমনিতে প্রবাহিত ছিল। 'মনুসংহিতা' তিনি পড়েছেন। গ্রন্থটি তাঁর ভাল না লাগলেও তিনি প্রত্যাখান করেন নি। গান্ধির প্রগতি বিরোধিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। সমকালে অনেক ব্যক্তিত্ব যখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ছিলেন, ঠিক তখন গান্ধিজি 'Young India' (12 March, 1925) এবং 'Harijan' (2 May, 1936) পত্রিকায় বলেছেন, এটা হচ্ছে সর্বনাশা শিক্ষা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারকে তিনি ভালভাবে নেননি। Harijan' (2 May, 1936) পত্রিকায় গান্ধিজি "Contraception – most pernicious education". শিরোনামে লিখেছেন –

> "To ask India's women to take to Contraceptives is, to say the least, putting the cart before the horse. The first thing is to free her from mental slavery, to teach her the sacredness of her body and to teach her the dignity of national service and the service of humanity."(২৫)

গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী 'The story of my Experiments with Truth' গ্রন্থে পর্দাপ্রথাকে বাজে প্রথা বলেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের 'Playing the Husband' – অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন –

> ".... and to a certain extent has even today, its own peculiar, useless and barbarous Purdah."(২৬)

১৯২৪ সালের ২২শে জুন 'নবজীবন' পত্রিকায় গান্ধিজি পর্দাপ্রথার ক্ষতিকর দিক 'The evil of Purdah' শিরোনামে আলোচনা করেছেন। তিনি এই প্রথা বন্ধ করার জন্য লেখনী চালনা করেছেন। তিনি লিখেছেন –

> "Moreover, the very fact of keeping a woman behind purdah has the effect of creating moral weakness in her. I believe that purdah helps not the maintenance but the destruction of morality."(২৭)

গান্ধিজি পর্দাপ্রথাকে স্বরাজ লাভের প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছেন – 'Purdah – a cruel impediment to Swaraj' (২৮) গান্ধিজি নারীর অলংকারকে দাসত্বের প্রতীক ('Jewellery-Symbols of Slavery') বলে মনে করেন। 'নবজীবন' (Navajivan, 22 Dec., 1929)পত্রিকায় তিনি লিখেছেন – " Hence I have looked upon these principal ornaments as mere symbols of slavery."(২৯) সর্বোপরি তিনি নারীকে স্বদেশ-সত্যাগ্রহী হওয়ার জন্য স্বদেশী ব্রত পালনের উপদেশ দিয়েছেন। স্বদেশী ব্রতের অংশ হল দেশীয় পদ্ধতিতে চরকায় বস্ত্র বয়ন, সুতো কাটা প্রভৃতি। গান্ধির দৃষ্টিতে এগুলি নারী ব্রতের

আবশ্যিক অংশ। স্বদেশী সত্যাগ্রহীই কেবল স্বরাজকে উপলব্ধি করতে পারে। 'New India' পত্রিকায় 'The Swadeshi Vow' শিরোনামে (1919, 19 April) তিনি লিখেছেন –

> "..... And if we decide to take the Swadeshi Vow in this spirit, ... it is sufficiently demonstrated to me that we can take the full Swadeshi Vow only in respect of our clothing, whether made of cotton, silk or wool."(৩০)

প্রকৃত স্বদেশী হওয়া এক সাধনা। গান্ধির দৃষ্টিতে 'Swadeshi – a religious duty.'(৩১) গান্ধিজি ভারতের বিস্তীর্ণ চারণক্ষেত্রে নারীকেও স্বদেশী সাধনার ব্রত গ্রহণের প্রেরণা দিয়েছেন। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন রমণী। ভারতীয়রা দুঃখ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বরাজ সাধনায় তৎপর হয়ে ওঠেন। নারীও এই সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ – "The Swadeshi of our Conception safeguards both dharma and artha."(৩২)

অপরপক্ষে, আম্বেদকরের প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কুপ্রথাগুলিকে উপড়ে ফেলা। বৃহত্তর পচনশীল সমাজের বিরুদ্ধে একা সব্যসাচী হয়ে তিনি যেন কঠিন যুদ্ধে নেমেছিলেন। অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নিরক্ষতা, দারিদ্র্য, গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস এগুলির বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রাম। এই লড়াইয়ে সমাজের উচ্চবর্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তেমন কোন সমর্থন তিনি পান নি। গান্ধি যেখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণে কনট্রাসেপটিভ ব্যবহারে সম্মত ছিলেন না, আম্বেদকর সেখানে বলেছেন –

> "It is, however, necessary to remember that mere equal distribution will never be able to bring about a permanent and material amelioration of the condition of the masses unless the growth of the population is controlled by means of family limitation."(৩৩)

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ড. আম্বেদকরের এক মহান কীর্তি 'হিন্দু কোড বিল' ('Hindu Code Bill') আইন প্রণয়ন। এই আইনে হিন্দু রমণীর ধর্মীয় সংস্কার ও প্রথাকে অবলুপ্ত করে সাধারণ আইন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। এই আইনে অভিন্ন নাগরিক বিধি তৈরির প্রয়াস নেওয়া হয়। এখানে হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনকে সংস্কার ও সংযোজন করা হয়েছে। বিবাহ, দত্তক, উত্তরাধিকার, যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির বন্টন, বর্ণের বিশেষাধিকার প্রভৃতি হিন্দু আইনগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বেমানান।এগুলিতে অভিন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ড. আম্বেদকর এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মহিলাদের অবস্থানের উন্নতির জন্য একটি মান্য পরিশীলিত ব্যবস্থাকে আইনি রূপ দিতে চেয়েছেন। হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকার এই আইনেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রের

সাথে কন্যারও সম্পত্তিপ্রাপ্তি, আন্তঃবর্ণ বিবাহের বাধা বিলুপ্তি, নাগরিক ও ধর্মীয় বিবাহের সংস্কার এবং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবর্তন প্রভৃতি এই বিলে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ড. আম্বেদকর বিলের খসড়া সংশোধন করে কিছু ছোট পরিবর্তন করেন। এই বিলের প্রথম অংশে ড. আম্বেদকর লিখেছেন, যারা হিন্দু হিসেবে বিবেচিত হবেন, তারা জাতিভেদ প্রথা দূর করার প্রয়াস নেবেন। এই বিলে স্পষ্ট ছিল নারীর সম্পত্তির অধিকার। অর্থাৎ সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার। এবং পারিবারিক সম্পত্তিতে বিধবা নারীর অধিকার। বিলটির অনেক অংশই ছিল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ। কিন্তু রক্ষণশীলদের বিরোধিতার কারণে বিলটির ৫৫ টি ধারার মধ্যে মাত্র ৩টি ধারা পাস হয়েছিল। এই বিলের বিরোধিতা প্রধানত পুরুষদের দিক থেকে এসেছিল। কংগ্রেসের মহিলা শাখা বিলটিকে সমর্থন করেছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল, হিন্দুধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থন যোগ্য নয়, প্রশ্রয়যোগ্য নয়। তাছাড়া, নারীকে সম্পত্তির অধিকার দিলে হিন্দু সমাজের ভিত্তি ভঙ্গুর হয়ে যাবে। ড. আম্বেদকর এমন যুক্তিকে মান্যতা দিতে পারেন নি। হিন্দু রমণীর সম্পত্তির অধিকার প্রসঙ্গে (Hindu Code Bill (4) : Property Rights of Hindu Women) ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাবাসাহেব 'Central Legislative Assembly' – এর বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বলেছেন –

> "Mr. President Sir, Now I Come to women's Property. I do not know how many Members of this House are familiar with the intricacies of this subject. So far as I have been able to study this subject, I do not think that there is any subject in the Hindu law which is so complicated, so instricate as women's property."(৩৪)

আম্বেদকর নিম্নবর্গীয় দলিত রমণীদের কয়লা খনিতে নিরাপত্তাহীন কাজের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। ১৯৪৫ সালের ১৩ মার্চ 'Central Legislative Assembly' –র সভায় এই বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেছেন –

> "I appeal to the House to take a realistic view of this matter ..... Our impression about the effect of the elimination of women from underground work is that it is on the whole not suited to the Conditions in which the miners live."(৩৫)

গান্ধি এবং আম্বেদকর দু'জনেই পণপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু আম্বেদকরের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে লেখনী চালনা, অপরদিকে জনসভা ও সম্মেলন। অ্যাসেম্বলির বিতর্কে অংশগ্রহণ করে তিনি ঘটনার প্রকৃত বাস্তবতা সমগ্র ভারত-বাসীর দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। নিম্নবর্গীয় রমণীদের সংগঠিত করে আন্দোলনকে তিনি পরিপূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন। এদিক থেকে তিনি ঈর্ষণীয় সাফল্যও পেয়েছেন। অস্পৃশ্য রমণীদের

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য থেকে মুক্ত করা একদিনে সম্ভব হয়নি। ভারতীয় সমাজে সে সংগ্রাম আজও বহমান।

একজন অহিংস আন্দোলন ও দুঃখ বরণের মধ্য থেকে জাতির মুক্তিপথের সন্ধান করেছেন – তিনি গান্ধি। অপরজন অস্পৃশ্যতার শেকড়শুদ্ধ উৎখাত করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়েছেন– তিনি আম্বেদকর। একজন পল্লিকোণের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয় গ্রাম্যবধূকে প্রত্যক্ষ করেন। অপরজন ভর দুপুরের বৈশাখী তপ্ত রৌদ্রে অস্পৃশ্য রমণীকে পুড়ে যেতে দেখেন। একজন অস্পৃশ্যতাকে কলঙ্ক মনে করেন। অপরজন সেই কলঙ্কচিহ্নকে উৎপাটিত করে ক্ষতের উপশম করেন। একজনের ডাকে মাতঙ্গিনী শহীদ হয়ে ওঠেন, রমণী চরকায় সুতো কাটেন, স্বদেশী ব্রত পালন করেন। অপরজন অস্পৃশ্য রমণীর পুষ্করিণীতে জল নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নেতৃত্বেই অচ্ছুত নারী কালারাম মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যান। একজন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নির্যাতিতা রমণীর যন্ত্রণায় বেঁচে থাকার নিষ্ফলতার কথা বলেন। অপরজন সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতার অধিকারের কথা বলেন। একজন নারী প্রগতিতে ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারকে মান্যতা দেন, নারী প্রগতির ক্ষেত্রে তিনি আত্মিক-দ্বন্দ্ব সংকটে ভোগেন। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো বা পেছনের দিকেও তাকান। অপরজন নারীর সম্পত্তির অধিকার, বিধবা নারীর সম্পত্তির অধিকার, পুত্রকন্যার সমান অধিকার, অসবর্ণ বিবাহ, অস্পৃশ্য নারীর অন্ধকার খনিগর্ভে কাজের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিলের জন্য তীব্র সতর্ক লড়াই জারি রাখেন। তবুও গান্ধি হয়ে উঠেছেন সেদিনের ভারত আত্মা। ভারতবাসীর বটবৃক্ষের ছায়া। সেদিন তিনি ছিলেন রাজপথ। তাঁর ভাবনা যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে আম্বেদকরের সুবিশাল সামাজিক সমতার কর্মপ্রস্তুতি। একজন অহিংস মন্ত্রের আলোকশিখা দিয়ে পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন। অহিংসা যে সমাজ পরিবর্তনের সুকঠিন অস্ত্র হতে পারে, সেটা গান্ধিই পৃথিবীবাসীকে প্রথম বুঝিয়েছিলেন। সহস্র শতাব্দীর স্নিগ্ধ আলো তিনি মানবজাতির জন্য রেখে গেছেন।

অপরজন ভারত আত্মার দ্বিতীয় সংস্কারক। তিনি মানুষের সৃষ্ট পঙ্কিলতাকে দু'হাতে তুলে ভারতবাসীর সমতার যাত্রাপথকে সুগম করার চেষ্টা করেছেন। শতশত শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যে অসুস্থ অসম সমাজের জন্ম দিয়েছিল, তাঁর ফলস্বরূপ এত পাপ, এত অকল্যাণ, এত বিষমতা, এত শোষণ ও অব্যবস্থা। জঞ্জালের দুর্গন্ধময় স্তুপরাশি এমনভাবে ভারতবাসীকে কূপমণ্ডূক করে ফেলেছিল যে, তাকে দূর করতেই যেন ভারতভূমিতে অস্পৃশ্য আম্বেদকরের আবির্ভাব। বহু শতাব্দীর অস্পৃশ্যতার জগদ্দল পাথরকে তিনি সরাতে চেষ্টা করেছেন। স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনয়ন করে পূর্বপুরুষের মুক্তি এবং ভারতভূমিকে পবিত্র করেছিলেন রাজা সগরের বংশধর ভগীরথ। ঠিক তেমনি ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে থাকা স্তূপীকৃত কলঙ্ককে দু'হাতে উৎক্ষেপণ করে নিজেই হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। এই

ব্যধিগ্রস্ত কুসংস্কার আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের এমন মহান কর্মসচিবের কোন তুলনা হয় না। দু'জনের তুলনা-প্রতিতুলনা স্বয়ং দু'জনেই।

তথ্যসূত্র:

১।, Mohandas karamchand Gandhi, Birth and perentage, The Story of My Experiments With True an Autobiography, Om Books international, New Delhi, 2010, P.4

২। Dr. B.R.Ambedkar, Ambedkar Speaks, vol.1, Edited by Narendra Jadav, Konark publishers pvt. Ltd., New Delhi, Seattle, 2013, P.462

৩। ibid

৪। Mohandas karamchand Gandhi, Child Marriage, The Story of My Experiments with truth an Autobiography, Om Books international, New Delhi, 2010, P.12

৫। Mahatma Gandhi, The Essential writings, Oxford world's classics, Oxford University Press, Oxford, New York, Edited by Judith M. Brown, 2008, PP.163-164

৬। Mohandas karamchand Gandhi, Child Marriage, The Story of My Experiments with truth an Autobiography, Om Books international, New Delhi, 2010, P.9

৭। Dr. B.R.Ambedkar, Mahad Satyagraha is for laying the foundation of Equality, Presidential Speech, Mahad Satyagraha Conference, Edited by Narendra Jadav, Konark publishers pvt., Ltd., Vol.1, New Delhi, Seattle, 2013, P.93-94

৮। ibid, upliftment of Untouchables and the Role of women, Ambedkar Speaks, Vol.1, P. 461

৯। Tendulkar, Mahatma (vol.III), Great Trial, Publications Divisions, Govt. of India, 1961

১০। Vasant Moon, Dr. Babasaheb Ambedkar, Translated by Asha Damle, National Book Trust, India, Nehru Bhawan, New Delhi, 2021, P.41

১১। ibid, P. 50

১২। ibid, P.91

১৩। ibid, PP.193, 194

১৪। ibid, P.196

১৫। Dr. B.R.Ambedkar, Progress of the Community is Measured by Progress of women, All India Depressed classes women's Conference, Nagpur, July 20, 1942, Edited by Narendra Jadav, Konark Publishers Pvt. Ltd, Vol.1, New Delhi, Seattle, 2013, P.462

১৬। Mahatma Gandhi, The Essential writings, Oxford world's classics, Oxford University
Press, Oxford, New York, Edited by Judith M. Brown, 2008, PP.262-263

১৭। ibid, P.228

১৮। ibid

১৯। ibid, Family Life first, P.230

২০। ibid, Women's rights, PP. 228-229

২১। ibid, P. 229

২২। M.K.Gandhi, Indian Home Rule (Hind Swaraj), Promilla and Co; Publishers, New
Delhi and Chicago, 2020, P. 221

২৩। Mahatma Gandhi, The Essential writings, Oxford world's classics, Oxford University
Press, Oxford, New York, Edited by Judith M. Brown, 2008, PP. 238

২৪। ibid, P. 240

২৪.ক। ibid, P. 244

২৪.খ। ibid, P.245

২৫। ibid, P. 253

২৬। Mohandas karamchand Gandhi, Playing the Husband, The Story of My Experiment with truth an Autobiography, Om Books international, New Delhi, 2010, P.15

২৭। Mahatma Gandhi, The Essential writings, Oxford world's classics, Oxford University
Press, Oxford, New York, Edited by Judith M. Brown, 2008, PP.254

২৮। ibid, P.254, Young India, 28 June 1928. Vol. xxxvi, P.470

২৯। ibid, P.255, Navajivan, 22 Dec., 1929, Vol. xiii, PP. 304-7

৩০। ibid, P. 259, The Swadeshi Vow -1, New India, 19 April, 1919, Vol.iii, PP.338-41

৩১। ibid, P.275, Navajivan, 19 June 1927,
৩২। ibid, P. 269, Pure Swadeshi, Navajivan, 11 July 1920
৩৩। Dr.B.R.Ambedkar, On measures for Birth Control, Ambedkar Speaks, Vol.1, Edited By Narendra Jadav, Konark publishers Pvt.Ltd. New Delhi, Seattle, 2013, P.382
৩৪। ibid, Vol-II, Hindu Code Bill(4) : Property Rights of Hindu women, English Speech In the Central Legislative Assembly, Constituent Assembly (Legislative) Debats, Feb. 24, 1949, P.376
৩৫। ibid, Vol.II, Need For immediate Reposition of Ban on employment of women Underground in Mines, Central legislative Assembly, March 13, 1945, PP. 215, 216